সংবাদ

তারিখ 26 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

‘আমরা উচ্চশিক্ষা চাই, লাশ হতে চাই না’

পলাশ চৌধুরী

সুস্থ ছাত্ররাজনীতি থেকেই এই দেশে অনেক ‘জাতীয় নেতা’ সৃষ্টি হয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আরও উল্লেখ করা যায় তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু, রাশেদ খান মেনন, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, মতিয়া চৌধুরী, হাসানুল হক ইনুসহ আরও নাম। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও প্রকারান্তরে ছাত্র রাজনীতিরই সৃষ্টি। কিন্তু সত্তরের দশকের পর থেকে ছাত্ররাজনীতির ধারা পাল্টাতে থাকে। ভূখোর, বাগ্মী, আপসহীন, আদর্শবান ছাত্রনেতার বদলে ‘সুবিধাভোগী’ এবং ‘পল্টিবাজ’ নেতাদের আগমন ঘটতে থাকে রাজনীতির ময়দানে। ফলে খুব সহজেই ছাত্ররাজনীতির সুসময় বদলাতে থাকে। এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে রাজনীতির ক্ষেত্র, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জনগণের কাছে ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা পৌঁছতে থাকে। ধীরে ধীরে কালিমালিপ্ত হয়ে, আদর্শের শেষ তলানিতে এসে প্রায় বেহাল দশায় পৌঁছায়। ফলস্বরূপ ‘ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে’ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে দিনকে দিন জৌলুস হারাচ্ছে ছাত্ররাজনীতি।

সারাদেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির যে অবস্থা ঠিক তেমনটাই আদর্শের বদলে কেবল ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের রাজনীতির চর্চা চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরসহ বাম ছাত্রসংগঠনগুলো আদর্শের ‘ছাত্ররাজনীতির’ চর্চা এখনো করে উঠতে পারছে না। ফলে মাঝেমাঝেই ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ক্যাম্পাস। গত ১২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির অধ্যুষিত শাহ আমানত হল দখলকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ-শিবির এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে প্রাণ হারায় এক ছাত্র। নিহত হচ্ছে, পঙ্গু হচ্ছে অনেক ছাত্র। তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে এসব সংঘর্ষে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ, ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে উচ্চশিক্ষা। দিনের পর দিন পিছিয়ে যাচ্ছে জাতি। সমাজ ও পরিবারের কাছে ‘ছাত্ররাজনীতির’ সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, উত্তর রাজনীতির ভবিষ্যৎ। আর আমরা হারাচ্ছি এক একটি মেধাবী শিক্ষার্থীকে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাড়ে চার বছরে নিজেদের মধ্যে প্রায় ৭০ বার সংঘর্ষ বাধিয়েছে আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ। এছাড়া অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের সঙ্গেও ছাত্রলীগ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে অন্তত ২০ বার। এসব সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনায় গত পাঁচ বছরে ৬ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় তিন শতাধিক নেতাকর্মী। সংঘর্ষের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকায় এ পর্যন্ত অন্তত ৪০ শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর গত ৪৭ বছরে বিভিন্ন সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ১৭ জন শিক্ষার্থী!

ছাত্ররাজনীতির অর্থ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিংবা নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে রাজনীতি করা নয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি অন্যভাবে বলা যায়, সব ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মাঝে আমরা এই প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করি। ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ শুধু মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবেই ‘ছাত্ররাজনীতিতে’ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে না, একজন সামাজিক মানুষ হিসেবেও চিহ্নিত করে। কিন্তু এর বিপরীতে অবস্থান নিয়ে ছাত্রনেতারা সাধারণ ‘শিক্ষার্থীদের জিম্মি’ করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করতেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। শিক্ষকরাও নিজেদের স্বার্থ হাসিলে ছাত্রনেতাদের ব্যবহার করে থাকেন। ছাত্ররাজনীতির এ গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে আসা উচিত।

তবে সব ছাত্রনেতাই বা সব ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরাই যে ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতি করেন- এমনটি বলা যাবে না। অনেক নির্ভেজাল আদর্শবান ছাত্রনেতা রয়েছেন- যারা সংগঠনকে ভালোবাসেন, সুস্থ ছাত্ররাজনীতির চর্চা করেন, রাজনীতির মাঠে নিজেকে উজাড় করে দেন। তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। চাইলেও তারা অনেক সময় ‘ভালো ছাত্ররাজনীতি’ উপহার দিতে পারেন না। ফলে ‘ছাত্ররাজনীতির’ ব্যর্থতার দায়ভার কিংবা যেকোন হীন কাজের মূল্যায়ন বেশিরভাগ সময় তাদের ওপরও বর্তায়। অর্থাৎ অসৎ ‘ছাত্ররাজনীতির’ ভিড়ে তারা টিকে থাকতে পারেন না। ফলে এক সময় আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে বরং রাজনীতিই ছেড়ে দেন, এমন অজস্র উদাহরণ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু পরে ‘ইচ্ছা’ কিংবা ‘অনিচ্ছায়’ ধীরে ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। লেখাপড়াকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সবসময় মেতে থাকেন ‘রাজনীতি’ নিয়ে। ছাত্ররাজনীতির মোহে আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন কিংবা পরিবারের কাছে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করেন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, প্রতিটি শিক্ষার্থী মানেই এক একটি পরিবারের স্বপ্ন। তাই উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে কোন পরিবারই চায় না তার সন্তান লাশ হয়ে ফিরে আসুক। এটি যেমন বেদনার বিষয়, ঠিক তেমনি মর্মান্তিক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বোধোদয় হবে কবে? এই অপ ‘ছাত্ররাজনীতির চর্চা’ দূর করা কি খুবই দুরূহ ব্যাপার?

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হাজারও সমস্যায়-জর্জরিত। শাটল ট্রেনে হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতিদিন প্রায় ২২ কি. মি. পথ দাঁড়িয়ে যাতায়াত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা নাজুক। শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা প্রকট। নেই ছাত্র-শিক্ষক সম্মেলন কেন্দ্র। ক্যাম্পাসে মুক্তবুদ্ধির চর্চা প্রায় স্তিমিত। এছাড়াও রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগেও প্রায় বন্ধ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের’ স্লোগান। এসব সমস্যা নিরসনকল্পে কখনো কোন ছাত্রসংগঠনকেও আন্দোলন করতে দেখা যায়নি। এমনকি একটি মানববন্ধন পর্যন্তও হয়নি। এ ব্যর্থতার দায়ভার বর্তমান কালের তথাকথিত আদর্শচ্যুত ‘ছাত্রনেতারা’ কখনোই এড়াতে পারেন না।

আমরা সত্তরের দশকের আগের আত্মমানবতার সেবায় সর্বদা নিয়োজিত ‘ছাত্রনেতা’ চাই। যারা বদলে দিতে পারবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ‘ছাত্ররাজনীতির’ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃত মেধাবী ছাত্ররাই রাজনীতি করবে, ছাত্রদের হাতে কিরিচ, রামদা, চাপাতি, পিস্তলের বদলে শোভা পাবে ছাত্রদের অধিকার রক্ষার ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন। যারা দেশটাকে বদলে দিতে পারবে, পারবে নিজে অভুক্ত থেকে বুভুক্ষ মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে। আর সেদিনই ৪৩ বছর আগের বাঙালির দেখা স্বপ্নরাষ্ট্র, সবুজ-শ্যামল, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন সার্থক হবে। অর্থপূর্ণ হবে স্বাধীনতার মানে। আমরা বিবেকের নবজাগরণের সমন্বয়ে গঠিত ত্যাগী, মহৎপ্রাণ, জনদরদি ‘ছাত্রনেতা’ চাই। যারা বাংলায় নতুন ভোর এনে দেবে।

[লেখক : শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]
palash89culive@gmail.com